বাংলা উপন্যাস ধারায় আশাপূর্ণা দেবীর অবদান।

বাংলা কথাসাহিত্যে একটি বহু উচ্চারিত এবং জনপ্রিয় নাম আশাপূর্ণা দেবী। চিত্তচমৎকারিণী কাহিনী রচনা করে আজ মুষ্টিমেয় যে ক'জন সাহিত্যিক আমাদের সাহিত্যের আসর আলোকিত করে রেখেছেন আশাপূর্ণা তাঁদের অন্যতম। একদা বাঙালী পাঠক সমাজে শরৎচন্দ্র এবং পরবর্তীকালে তারাশংকর এবং বিভূতিভূষণ যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, সাম্প্রতিক কালে আশাপূর্ণা দেবী সেই জনপ্রিয়তার অধিকারিণী। ঘরে বসে মানুষ যেখানে সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় নিত্যদিনের জীবন যাপন করছে সেখানেই মানুষের সত্যিকার ইতিহাস রচিত হচ্ছে। আমরা যাকে কথাসাহিত্য বলি তার উপকরণ সেই যথার্থ জীবনের ইতিহাস থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন,

"আমাদের সাহিত্যে ঐ ছন্দটিকে সর্বপ্রথম ধরিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুচ্ছের গল্পের মধ্যে। ..... মনের এ্যালকেমি-গুণে চোখে দেখা, কানে শোনা সামান্যটুকু অসামান্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেখানেই প্রতিভার প্রকাশ। আমরা যাকে পঞ্চেন্দ্রিয় বলি তার প্রত্যেকটিই অশেষজ্ঞানের উৎস। যাঁরা জাত লিখিয়ে, জাত শিল্পী, তাঁদের শিক্ষা একদিকে ইন্দ্রিয়গত, অপরদিকে হৃদয়গত।..একথা আশাপূর্ণা দেবীর বেলায় যতখানি সত্য এমন সকলের বেলায় নয়। "

সমালোচকের এ কথা সর্বাংশে সত্য। কেননা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরের কথা, আশাপূর্ণা একটি দিনের জন্যও কোন ইস্কুলে পড়েন নি। তার নিজের কথায়,- "আমাদের বাড়ি খুব রক্ষণশীল ছিল। মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পাট ছিল না। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তবে পড়েছি সর্বদাই। সেই পড়াটি বাড়িতে এবং শুধুই গল্প উপন্যাস। "

আশাপূর্ণা স্বয়ং লিখেছেন,- "উপন্যাস লিখেছি দেড়শোর বেশী আর ছোটগল্প হাজার দেড়েকের ওপর। ... বাল্য থেকে বার্ধক্যে দীর্ঘকাল ধরে লিখে চলেছি। ... যা দেখেছি আর দেখে যা মনে হয়েছে সেটাই লিখে চলেছি। " স্বামী এবং আশাপূর্ণার প্রায় সমবয়স্ক দেওরটি লেখার ব্যাপারে তাঁকে সব সময়ে উৎসাহ দিয়েছেন। আশাপূর্ণা দেবী নিজেও ছিলেন একজন আদর্শ পত্নী এবং আদর্শ গৃহিণী। সংসার-ধর্মে এবং সাহিত্য-কর্মে কোন বিরোধ ঘটেনি তাঁর জীবনে। সাহিত্যের প্রতি যতখানি তার আনুগত্য, সংসারের প্রতিও ততখানি। আলোচক আশাপূর্ণার ব্যক্তিজীবন তথা সাহিত্যজীবনকে তুলনা করেছেন নদীর সঙ্গে ; বলেছেন,— "নিজের সংসার, প্রতিবেশীর সংসার, নিত্য দিনের জীবন, চোখের সমুখে চলমান জীবনের যে ছবি, সাহিত্যে তারই প্রতিচ্ছবি। নদীর এক নাম চিত্রবহা, সে তার দুই তীরের চিত্র বহন করে চলে। ..... আশাপূর্ণা দেবী কখনো তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার বাইরে যান নি। এত যে গল্প উপন্যাস লিখেছেন, কত সব মানুষের কথা বলেছেন তারা সবাই চেনা মানুষ শুধু তার নয়, আমার আপনারও চেনা। "

আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য কর্মে একটি সহজের সাধনা আছে ; এজন্যে তার সমস্ত গল্পে কাহিনিতে একটি নিঃসংশয় সততার ছাপ পড়েছে। তার সৃষ্ট চরিত্র এবং বিবৃত ঘটনাকে অকৃত্রিম সত্য বলে গ্রহণ করতে একটুও বাধে না। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের এমন অন্তরঙ্গ ছবি সে কারণেই বাঙালী জীবনের দিবারাত্রির কাব্য হয়ে উঠতে পেরেছে। তিনি নিজেই তার সাহিত্যের এই প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই এ ব্যাপারে লিখেছেন,- "আমি কখনো আমার জানা জগতের বাইরে কোথাও পা ফেলতে যাই না এবং আমার সেই জগৎটি একেবারে চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবু তার মধ্যে দেখে চলেছি কি অফুরন্ত জীবন বৈচিত্র্য। কী বিচিত্র সব চরিত্র। "

আশাপূর্ণার উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। তার নিজের হিসাবে প্রায় দেড়শো। সম্ভবত আসল হিসাবটা আরো বেশি। সেকারণে তার সব উপন্যাসের আলোচনা সডব না হলেও কয়েকটি উপন্যাসের নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। যেমন—'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা', 'যে যার দর্পণে', 'যোগ বিয়োগ', 'অগ্নিপরীক্ষা', 'শেষ রায়', 'সকাল সন্ধ্যা', 'সিড়ি ভাঙা অঙ্ক', 'দূরের জানালা, 'নকশাকাটা ঘর', 'এই তো সেদিন', 'চার দেওয়ালের বাইরে', 'এক সমুদ্র অনেক ঢেউ', 'অচল পয়সা', 'কখনো কাছে কখনো দূরে', 'অনমনীয়', 'অন্য মাটি অন্য রঙ', 'পয়সা দিয়ে কেনা', 'অবিনশ্বর', 'হঠাৎ একদিন', 'স্থান কাল পাত্র' ইত্যাদি।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা' এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে সার্থক পরিচয় মিলবে আশাপূর্ণার সাহিত্যপ্রতিভা ও জীবনদৃষ্টির। তিনটি পৃথক উপন্যাস হলেও আসলে এই তিনটি মিলে এটি আশাপূর্ণার ট্রিলজি উপন্যাস। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা' তিনে মিলে আশাপূর্ণা দেবী এক বিরাট ক্যানভাসে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্রটিকে ধরেছেন। বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারের তিনটি জেনারেশানের ইতিহাস এখানে বিবৃত। তিন জেনারেশানের তিনটি রমণী—মা, মেয়ে ও নাতনিকে ঘিরে এই কাহিনি। তিনজনেরই জীবন ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ তিনটি নারীই আসলে ট্র্যাজেডির নায়িকা।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র কেন্দ্রিয় চরিত্র সত্যবতী। এক রক্ষণশীল এবং প্রাচীনপন্থী পরিবারে বধু হিসাবে এসেছে সত্যবতী। সত্যবতী নিজে সুশিক্ষিতা, সাধ ছিল কন্যা সুবর্ণলতাকে শিক্ষায় দীক্ষায় মনের মতো করে গড়ে তুলবেন। কিন্তু রক্ষণশীল পরিবারের প্রাচীনপন্থী ঠাকুরমায়ের পরামর্শে, বাপের সম্মতিতে সে কন্যার নবছরে গৌরীদান হয়ে গেল, মাকে না জানিয়ে। সত্যবতী তেজস্বিনী মহিলা ; নিদারুণ অভিমানে আপন সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। স্বামী কন্যা কারো সঙ্গেই আর সম্পর্ক রাখেন নি।

দ্বিতীয় খণ্ড তথা 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের আশ্রয় সত্যবতী কন্যা সুবর্ণলতা। সুবর্ণলতাকে সংসারে কেউ বোঝেনি—মাতা পিতা স্বামী পুত্রকন্যা সকলের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা। সুবর্ণলতা বালিকা বয়সেই মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিতা, ব্যক্তিত্বহীন পিতা থেকেও নেই, স্বামীটি অত্যন্ত স্থূল প্রকৃতির সন্দিগ্ধ-চিত্ত একটি পুরুষ, সুবর্ণলতার স্বামী হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সুবর্ণলতা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়নি। কিন্তু মায়ের মার্জিত রুচি এবং চিত্ত বৃত্তির কিছু সে নিঃসংশয়ে পেয়েছিল। ফলে স্বামীগৃহে অর্ধশিক্ষিত গেঁয়ো পরিবারটির সঙ্গে নিজেকে সে একেবারেই খাপ খাওয়াতে পারেনি। স্বামীর রুচিহীনতার কারণে সুবর্ণলতাকে বহু সন্তানবতী হতে হয়েছে। কিন্তু ছোট দুই কন্যাকে বাদ দিলে ছেলেমেয়ে সব কটিই বংশগত স্থূল স্বভাবের যোগ্য উত্তরাধিকারটি পেয়েছে পুরো মাত্রায়। মনের কথাটি বলার মানুষটি পায়নি সুবর্ণলতা। একাকীত্বের এই নিদারুণ অভাব সে মিটিয়েছিল মনের কথাগুলি হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণাগুলি খাতার পাতায় কলমের অক্ষরে প্রকাশ করে। অবসর মুহূর্তে বসে বসে নীরবে নিভৃতে তার মনের ভাবনাকে সে মেলে ধরেছিল একটি খাতার পাতায়। সুবর্ণকে কেউ বোঝেনি। আশাপূর্ণাদেবীই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে একটি নিখুঁত ট্র্যাজিক চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন না চেনার, না জানার, না বোঝার ট্র্যাজেডি। তাই অভিমানে বস্তা ভর্তি সমস্ত বই ছাতে নিয়ে গিয়ে সুবর্ণলতা নিজ হাতে একদিন তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। কনিষ্ঠা কন্যা বকুল সেই আগুনের ঝলকে বিদ্যুৎ চমকে মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেয়েছিল মায়ের মুখে অসীম ক্লান্তি আর অপরিসীম অন্তর্বেদনার ছাপ—এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে বইগুলোর দিকে।

এই বকুলকে নিয়ে গ্রন্থের তৃতীয় খন্ড- যা একটি পৃথক উপন্যাস 'বকুলকথা'। মা-দিদিমার মতো বকুলের জীবনও ব্যর্থই বলতে হবে। কিশোরী বকুল মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিল একটি ছেলেকে। ছেলেটিও তাকে ভালোবাসত। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে যেমনটা হয়—ছেলেটি লক্ষ্মী ছেলের মতো অভিভাবকের আজ্ঞায় অপর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে। বকুলের বিবাহের সাধ এখানেই মিটে গিয়েছে। বিয়ের চিন্তা বকুল আর মনে স্থান দেয়নি। মায়ের মতোই নিঃসঙ্গ তারও জীবন, তারও কেবল মনোজগতে বিচরণ। পিতৃগৃহেই বাস কিন্তু সুবর্ণলতার মতো সেও নিজ বাসভূমে পরবাসী। শৈশবে মায়ের কাছে পেয়েছিল শোভন রুচিবোধ, কিন্তু সারা জীবন কাটাতে হল স্থূলতার সংস্পর্শে, ক্লেদ পঙ্কের মধ্যে। কিন্তু এরই মধ্যে সে হয়েছে লেখিকা। জীবনের এই অভিজ্ঞতা ও অনুভবগুলি সে প্রকাশ করে তার লেখায়।

অনেকে বলেন, আশাপূর্ণা দেবী আমাদের পুরুষ-শাসিত সমাজে নিপীড়িত নারীজাতির মুখপাত্রী। তিনি একস্থানে বলেছেন- "যখন আমার খুব কম বয়েস তখন থেকেই দেখতাম পারিবারিক জীবনে ... ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশী তফাৎ।... এটা আমাকে খুব বিদ্ধ করত। ... আমার সেই নিরুষ্টার প্রতিবাদগুলোই যেন এক একটি প্রতিবাদের প্রতিমুর্তি হয়ে আমার কাহিনীর নায়িকা হয়ে দেখা দিয়েছে।" তবে আশাপূর্ণা দেবী খুব ভালো করেই জানেন যে নারী নির্যাতনে পুরুষের হাত যতখানি নারীর হাতও ততখানি। সুবর্ণলতার জীবন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল, সে কি শুধু তার পিতা আর স্বামীর দোষে? তার ঠাকুরমা আর শাশুড়ির দোষ কি কিছু কম? যে অর্থে আজ বহু লেখিকাকে নারীবাদী আখ্যা দেওয়া হয়, আশাপূর্ণাকে সে অর্থে নারীবাদী বলা যাবে না। কেননা তিনি প্রায় নিরপেক্ষভাবে অঙ্কন করেছেন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাধিকে এবং মহত্বকেও। পুরুষের আধিপত্য, অত্যাচার, অবিচার, অনাচার যেমন এঁকেছেন, তেমনি এঁকেছেন তার উদারতা ও মহত্বকেও।

একইভাবে তাঁর কথাসাহিত্যে রূপায়িত অসংখ্য নারীর মধ্যে শুধু সর্বংসহা মহৎ মূর্তিই অঙ্কিত হয়নি, অঙ্কিত হয়েছে তার স্বার্থপরতার ভয়ংকরতাও। নারীর প্রতি স্বভাবতই একটি সহানুভূতি থাকলেও আশাপূর্ণা দেবীর নিজ জীবনের অভিজ্ঞতায় নারীর ভিন্ন স্বার্থপরতার ও অত্যাচারী মূর্তিও আছে। নিজের মা-কেই দেখেছেন ঠাকুরমায়ের কাছে অত্যাচারিত হতে। বলেছেন— "ঠাকুরমা কোন কালেই মাকে সুনজরে দেখেননি, হেনস্তা করেছেন।" মনে হয় মায়ের এই শাশুড়ীটিই পরে তাঁর উপন্যাসে সত্যবতীর শাশুড়ি বা সুবর্ণলতার শাশুড়ী হয়ে দেখা দিয়েছেন। স্বার্থসর্বস্ব আধুনিকাদের সম্পর্কেও তিনি সহানুভূতিশীল হতে পারেন না- "অধিকারহীন অবলাদের দুঃখের কথা বলেছি বৈকি কিন্তু আজকের স্বাধিকারমত্তা সবলাদের দেখেও খুব একটা আনন্দ পাচ্ছিনা!"

আশাপূর্ণা দেবী তার 'শশীবাবুর সংসার' (১৯৫৬), 'যোগ বিয়োগ' (১৯৬০) ইত্যাদি একাধিক উপন্যাসে শহরে মধ্যবিত্ত জীবনকে গ্রহণ করলেও প্রধানত শরৎচন্দ্রীয় ভাবনার একান্নবর্তী পরিবারকেই নতুন কালের পরিবেশে উপস্থিত করেছেন। তাঁর উপন্যাসের শহুরে মানুষগুলি—কি পুরুষ, কি মহিলা—সকলেই গার্হস্থ্য জীবন-ভাবনায় একনিষ্ঠ, এবং তারই সূত্রে তাদের স্বার্থ-নিঃস্বার্থ ভাবনা, লোভ, ঈর্ষা, নীচতা, উদারতা, মানবিক বোধবুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। শহুরে জীবনের যে জটিলতা, যে নিষ্করুণ অবক্ষয়, যে নৈতিক অবধারিত অধঃপতন, অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের মধ্যে যে স্বাভাবিক রেষারেষি, তার পরিচয় আশাপূর্ণার সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত। আশাপূর্ণা বলেছেন— "যা লিখেছি আমার দেখা মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডি থেকেই দেখা।"